বাংলা নাটকে সংগীতের প্রয়োগ প্রসঙ্গ : আদি ও মধ্যযুগ

লায়লা ফেরদৌস*

[সারসংক্ষেপ : ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের স্বতন্ত্র শৈলীর মধ্য দিয়ে কালপ্রবাহে টিকে থাকা এবং এই টিকে থাকা নাট্য আঙ্গিকের একটি সুস্থিত রূপচিত্র তৈরির পর্যায় হিসেবে বাংলা নাটকের পরিবেশনারীতি বিশেষ করে নাটক পরিবেশনার ক্ষেত্রে সংগীতের প্রয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধ। বিশ্ব নাটকের প্রাচীন পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলা নাটকের উৎস অনুসন্ধানে জানা যায়, সুপরিকল্পিতভাবে নয়, বরং বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি গভীর বিশ্বাসের ভিত্তিতে পালিত আচার-অনুষ্ঠান থেকেই বিশ্ব নাটক তথা বাংলা নাটকের উদ্ভব। আদি মানবের অর্থদ্যোতক দেহভঙ্গিমা তার মূর্তি বা প্রতীক ভাবনা চিত্রে, ভাস্কর্যে ও নিজ দেহের পেশি, কণ্ঠ, মাথা, ঘাড়, বুক, কাঁধ, হাত, কোমর ও পায়ের নানান ভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছিল। অর্থাৎ মানবের আদি প্রচেষ্টায় অনুকরণের বিষয়টি ছিল মুখ্য। হোক সে পশুপাখির শারীরিক অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ বা কণ্ঠের। সে বিবেচনায় নাটক ও সংগীতের উদ্ভব পুরাণ-অভিন্ন মনে হলেও সাহিত্যের উক্ত দু'ধারা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও স্বাধীন পরিণতি ঘটিয়ে এদেশে স্বকীয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। উৎপত্তির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি প্রবহমান বাংলা নাটকের নাট্যিক উপাদানের বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় 'সংগীত' (গীত) প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে আজও বাংলা নাটকের মুখ্য অবলম্বন হিসেবেই টিকে আছে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা নাটক ও বাংলা সংগীতের উদ্ভব, বাংলা নাটকে সংগীতের প্রভাব ও প্রয়োগ প্রসঙ্গ আলোচনার প্রয়াস থাকবে।]

দেশ কাল প্রতিবেশের ছাঁচে গড়ে ওঠা জীবিকাভিত্তিক জীবনসম্পৃক্ত সাহিত্য মানুষের সর্বপ্রকার ভাব, চিন্তা, কর্ম, আচরণ, শাস্ত্র, সমাজ, লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত। ঐহিক-পারত্রিক বিষয়ে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে ধর্মভাবের উদ্বোধন, প্রচার ও প্রসার, ব্যক্তি ও সমাজের জাগতিক কল্যাণ কামনা প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বলা যায় বাংলা সাহিত্য হলো লোক সমাজের প্রচলিত ব্রতকথা, শাস্ত্রকথা, লোকবিশ্বাস, আচার, সংস্কার, লোককাম্য, আদর্শ, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির গণবোধ্য হৃদয়বেদ্য সাহিত্যায়ন বা শিল্পায়ন। সাহিত্যের আধুনিক সংজ্ঞায় বাংলা সাহিত্যের সংজ্ঞায়ন তাই সম্ভব নয়। এ সাহিত্য উদ্ভবলগ্ন থেকেই আঙ্গিকে, ছন্দে, বিষয়ে, বক্তব্যে, লক্ষ্যে ও পরিবেশনায় স্বতন্ত্র। এরূপ প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ শাখা সংগীত ও নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ, রূপ-রূপান্তর ও আঙ্গিকের বিষয়টি পরিদৃশ্যমান। সংগীতের ভিতর দিয়ে বাঙালির বহুমুখী সৃজনশীলতার যে বিস্তৃত রূপ পরিদৃশ্যমান, তা সুদীর্ঘকাল ধরে সুবৃহৎ প্রেক্ষাপটে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে বিকাশ লাভ করেছে এবং অবশ্যই তা উপাখ্যান, কাব্য, নাট্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মুখ্য অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে সূচনালগ্নেই তা বিশেষ কোনো মাধ্যম পরিগ্রহ করেনি। প্রাথমিক পর্যায়ে তা ছিল মূলত কাব্য, যা সুর সহযোগে গীত হতো। তাই বাংলা নাটকে সংগীতের প্রয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে বাংলা নাটক ও বাংলা সংগীতের উদ্ভব ইতিহাস অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যেহেতু বাংলা নাটক ও সংগীত কোনো নির্দিষ্ট স্থান, কাল বা ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি, সেজন্য এর কোনো সুনির্দিষ্ট ইতিহাস বা

* প্রভাষক, রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

ধারাবাহিকতা আছে বলে মনে হয় না। সংগত কারণেই বাংলা নাটক ও সংগীতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিষয়টির অন্বেষণে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক উল্লেখ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলা যায়। এক্ষেত্রে বাংলা নাটক ও সংগীতের উৎপত্তি অন্বেষণের সমান্তরালে বিশ্ব নাটক ও সংগীতের উৎপত্তির প্রাসঙ্গিকতাও পরিলক্ষিত হয়েছে। নাটকে সংগীত প্রসঙ্গটি মানব সভ্যতার উদ্ভব প্রসঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত, তাই নাট্যের ও সংগীতের উৎপত্তি অনুসন্ধানকালে মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনাও জরুরি। বিশ্ব সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তৃতির ধারাটি লক্ষণীয়। প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতা, মিসরীয় সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, মায়া, আজটেক, ইনকা প্রভৃতি সভ্যতার পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রাচীন মানবের প্রাগৈতিহাসিক কালের জীবনায়নে ক্রমপ্রসারণ ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানব সভ্যতা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিল। তাই আদিম শিকার যুগের অরণ্যচারী জীবনায়নের দৃশ্যপটে মানবের সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞের ধারণা– 'সর্ব প্রথম মানুষ তার পরিবর্তনক্ষম দেহ ও কণ্ঠস্বর নিয়ে পশু-পক্ষীর অনুকরণ করেছিলো' (গীতাসেন, ১৯৭৫ : ৪)। অর্থাৎ মানবের আদি প্রচেষ্টায় অনুকরণের বিষয়টি ছিল মুখ্য। হোক সে পশু-পাখির শারীরিক অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ বা কণ্ঠের। প্রাচীন মানুষের অর্থদ্যোতক দেহভঙ্গিমা তার মূর্তি বা প্রতীকভাবনা চিত্রের, ভাস্কর্যে ও সবার আগে দেহের পেশিতে, কণ্ঠ, মাথা, ঘাড়, বুক, কাঁধ, হাত, কোমর ও পায়ের নানান ভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছিল (সেলিম, ১৯৮৯ : ২৪)। আদি মানবের অনুকরণের প্রয়াস থেকেই বিশ্ব নাট্য ও সংগীতের উদ্ভব বলে ধারণা করা হয়। সে বিবেচনা নাট্য ও সংগীতের উদ্ভব-পুরাণ অভিন্ন। যদিও সাহিত্যের এই দুই ধারা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও স্বাধীন পরিণতি ঘটিয়ে এদেশের স্বকীয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণ নাটকের পরিণতি লাভের কারণ হিসেবে যে তিনটি ধাপ বা স্তর অতিক্রমের কথা বলেছেন, তন্মধ্যে তৃতীয়টি নাট্য, যা নৃত্য-গীত সহ বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় (মন্মথমোহন, ১৯৫৯ : ৩)। তবে উৎপত্তির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি বাংলা নাটকের নাট্যিক উপাদানের বিবর্তন ও ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অব্যাহত থাকলেও নৃত্য ও গীত (সংগীত) প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে আজও বাংলা নাটকের মুখ্য অবলম্বন হিসেবে টিকে আছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের রচনানিবহে উল্লিখিত সংগীতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তা কাব্য ও নাট্যের অদ্বৈত আধার রূপেই বিবেচিত। আচার্য অভিনবগুপ্ত রচিত *অভিনবভারতী* গ্রন্থে *নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ* নামক এক ধরনের নাট্যাভিনয় সম্পর্কে জানা যায়, যা সংগীত ও নৃত্য সহযোগে মঞ্চস্থ হতো (জামিল, ২০০০ : ৪৯৮–৪৯৯)। এরূপ প্রেক্ষাপটে বাংলা নাটকের বেশ কিছু প্রকরণের প্রসঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষ, যেমন– কাব্য, চিত্ররাগ কাব্য, রাসক, ভানি প্রভৃতি– এসবই স্পষ্টত বাংলার কথানাট্য ও নাটগীত শ্রেণিভুক্ত, যেখানে সংগীতের রয়েছে প্রধান ভূমিকা। কিন্তু তা কাব্য ও নাট্যের অদ্বৈত আধার রূপেই বিবেচ্য। বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রাচীন বাংলা কখনো আর্য-সংস্কৃত নাট্যকলার মূলধারা অনুসরণ করেনি (জামিল, ২০০০ : ৪৯৮–৪৯৯)। এই মতের সমর্থন মেলে ভরত মুণি রচিত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থসহ পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য ও নাট্যভাষ্যকারদের বর্ণনায়, যেমন– বিশ্বনাথ (সাহিত্য দর্পণ), ধণিকা (দশ রূপক অবলোক), সারদা তানাইয়া (ভার প্রকাশন) প্রমুখ। এরূপ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, বাংলা নাটক সংগীত সহযোগে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছিল যেখানে আখ্যানের কাহিনি দর্শক সম্মুখে পরিবেশনের ক্ষেত্রে সংলাপের সহযোগী রূপে

সংগীতের ব্যবহার লক্ষণীয়। বাংলা নাটকের পরিবেশনায় সংগীতের প্রয়োগ ও ব্যবহার এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

বাংলা গান বলতে সাধারণ অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত গানকেই বোঝানো হয়। সে অর্থে *চর্যাপদ*কে কেবল বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনই নয় চর্যায় উল্লেখ্য পদগুলো প্রথম বাংলা গীত, যা *চর্যাগীতি* নামেই অধিক পরিচিত। *চর্যাগীতি*র পরিবেশনা সম্পর্কে ধারণা করা হয়, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিশেষ পোশাক পরিধান করে এ ধরনের নৃত্যগীত পরিবেশন করতেন। এ মতের সমর্থন মেলে কাহ্নপা রচিত একটি পদে–

তাণ্ডি বিকণআ ডোম্বি না চাঙ্গেড়া

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া ॥ (শশিভূষণ, ১৩৭১ : ১২০)

অর্থাৎ, কাহ্নপা বলেছেন– ওগো ডোম্বি, তুমি অবিদ্যারূপ তন্ত্রী এবং চাঙ্গারীরূপ বিষয়াভ্যাস বিক্রয় ও পরিত্যাগ করে থাক। অতএব তোমার জন্য আমি এই সংসাররূপ নটপেটিকা বা অভিনেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ রাখার বাক্সটি ত্যাগ করলাম। উল্লিখিত পদে নটপেটিকা শব্দের প্রয়োগ থেকে ধারণা করা হয় যে, চর্যাকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা চরিত্র অনুযায়ী পোশাক পরিধান করতেন যেগুলো নটপেটিকায় সংরক্ষণ করা হতো এবং এ ধরনের পোশাক পরিধান করে তারা নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা নৃত্য-গীত সহযোগে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করতেন। চর্যা পরবর্তী সময়ের নাথ-গীতি, গীতগোবিন্দ, অষ্টপদী গান, কৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলগান, নামকীর্তন, পদাবলি কীর্তন ও অন্যান্য ভক্তিমূলক অভিজাত গানের পরিবেশনার সাথে *চর্যাগীতি* পরিবেশনের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় (প্রজ্ঞানন্দ, ১৯৭০ : ২৮)। অর্থাৎ *চর্যাগীতি*র অনুপ্রেরণাই চর্যাপরবর্তীকালে অন্যান্য গীতশ্রেণির পাথেয় রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। *চর্যাপদ*এর ১৭ সংখ্যক চর্যায় উল্লেখ আছে–

নাচণ্ডি বাজিল গাণ্ডি দেবী

বুদ্ধ নাটক বিসমা হে ভই ॥ (Shahidullah, 1966 : 30)

উপর্যুক্ত পদ থেকে জানা যায়, *চর্যাপদ*-এ বর্ণিত বুদ্ধ নাটক নৃত্য-গীত সহযোগে পরিবেশিত হতো। এতে নারী-পুরুষের মিলিত অংশগ্রহণের কথা জানা যায় *চর্যাপদ*-এর ১০ সংখ্যক চর্যা পাঠে। উক্ত চর্যায় নৃত্যপটিয়সী ডোম্বীর নৃত্য-গীত সহযোগে নাট্য উপস্থাপনের কথার উল্লেখ রয়েছে (লায়লা, ২০১৮ : ৩১)। পরবর্তী সময়ে *নাথগীতিকা*র পরিবেশনায় একই পরিবেশনা রীতির প্রয়োগের কথা জানা যায়।

নাথ পরম্পরার প্রধান গুরু গোরক্ষনাথকে নিয়ে রচিত *গোরক্ষবিজয়* নাথগীতিকার অন্যতম একটি উদাহরণ। *গোরক্ষবিজয়* এর পরিবেশনা সম্পর্কে জানা যায়, তা কেবল ছড়ার আকারে বা পাঁচালির মতো খানিকটা সুর সহযোগে গীত হতো এবং *চর্যাগীতি*র চেয়ে *নাথগীতি*র গায়নপদ্ধতি ছিল সরল (করুণাময়, ১৯৯৩ : ২১–২৩)। কেননা, চর্যার মতো সুবিন্যস্ত ও সুনির্ধারিত প্রবন্ধগীতিতুল্য গায়ন *নাথগীতি*তে প্রযুক্ত ছিল না।

জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ*'র পরিবেশনা রীতি সম্পর্কে জানা যায় যে, রাজা লক্ষণ সেনের সভায় জয়দেব স্বয়ং *গীতগোবিন্দ* কাহিনি গেয়ে শোনাতেন এবং জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী অঙ্গভঙ্গি সমেত তা দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করতেন। অর্থাৎ *গীতগোবিন্দ*'র কাহিনি আসরে গীত হতো। এই একই ধারাবাহিকতায় চণ্ডীদাস রচনা করেছিলেন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। বিশেষজ্ঞের

ধারণা– 'এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিবেশনায় প্রথম উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গানের মাধ্যমে নাট্য কাহিনিকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়' (করুণাময়, ১৯৯৩ : ৩৪–৩৬)। অর্থাৎ, *চর্যাগীতিকা*র পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট গায়নরীতি সমেত বাংলা নাটকের সংগীতের যে ধারার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়, *নাথগীতিকায়* এসে তা সরল রূপ ধারণ করে এবং পরবর্তী সময়ে *গীতগোবিন্দ* এবং আরও পরে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* এসে তা উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কথকতায় রূপান্তরিত হয়, যার উপস্থাপনের মাধ্যম সুর বা গীত। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলেছেন– 'গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি পরিণতি তাহা এদেশে (বঙ্গদেশে) স্থান পায়নি। কাব্য (নাট্য)-কে অন্তরের মধ্যে ভালো করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এদেশে সংগীতের অবতারণা হয়েছিল' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩২ : ২৯৫)। বাংলা গানের উদ্ভব-পুরাণ পর্যালোচনা করে জানা যায়, অতীতে *চণ্ডীমঙ্গল*, *মনসামঙ্গল* এমনকি *অন্নদামঙ্গল*-এর মতো বৃহদায়তন নাট্যও সুর সহযোগে সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপিত হতো। এমনকি বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদসমূহও কেবল উপস্থাপনের অনুষঙ্গ হিসেবে গীতকে অবলম্বন করেছিল বলে অনুমেয় (করুণাময়, ১৯৯৩ : ৩)। অর্থাৎ রচনালগ্নে নাট্যকার নাট্যই রচনা করেছিলেন তবে সে নাট্যকাহিনি সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছানোর বাহন ছিল গীত। এই সুর ও কথকতার যুগল মন্থনেই তৈরি হয়েছিল বঙ্গীয় নাট্য ও সংগীতের প্রাথমিক যাত্রাপথ।

জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*'র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রাধা-কৃষ্ণ লীলাকাহিনি ও শ্রীচৈতন্যর জীবন অবলম্বনে বাংলায় যে বিপুল পরিমাণ পদ রচিত হয়েছিল, তা পদাবলি নামেই অধিক পরিচিত। ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে এই 'পদ' শব্দ দ্বারা গান বা গীতকেই বোঝানো হয়েছে। আবার মহাকাব্য *রামায়ণ*, *মহাভারত*েও 'পদ' শব্দ দ্বারা গানকেই সুনির্দিষ্ট করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত পুরাণ সাহিত্যেও গান অর্থে 'পদ' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষজ্ঞের মতে– 'কবি জয়দেব গানের সমার্থক রূপে পদ শব্দটিকে প্রথম ব্যবহার করেন' (সুকুমার, ১৯৭০ : ৩৯৬)। পদাবলির পরিবেশনা সম্পর্কে *চৈতন্য ভাগবতে* উল্লেখ আছে–

শিষ্যগণ বলেন, কেমন সংকীর্তন।
আপন শিখায় প্রভু শচীন নন্দন ॥
... ...
দিশা শিখায়েন প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপন কীর্তন করে শিষ্যগণ লইয়া ॥

উল্লিখিত পদ থেকে ধারণা করা হয়, পদাবলিতে শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনি বা আখ্যান ভক্ত বা দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপনের মাধ্যম ছিল গীত– যা তাল-লয় সহযোগে গায়েন-দোহার কর্তৃক গীত হতো।

বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের শাক্ত দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক এক শ্রেণির আখ্যায়িকা প্রচলিত হবার কথা জানা যায়। সুর সমেত গীত আকারে তা পরিবেশিত হতো– বিধায় এই শ্রেণির আখ্যায়িকা তৎকালে মঙ্গল গান বলে জনসাধারণের মাঝে পরিচিত হয়ে ওঠে, যা পরবর্তী সময়ে বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রথমে মঙ্গলকাব্য ও আরও পরে মঙ্গলনাট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগের ইতিহাস ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, *চর্যাপদ* থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত সকল রচনাই

রচনাকালে ছিল আখ্যান অর্থাৎ রচয়িতা কোনো কাহিনি বা আখ্যান রচনা করেছিলেন দর্শক বা ভক্ত সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য। কিছু গীত সহযোগে তা উপস্থাপিত হওয়ায় প্রাথমিক বিবেচনায় জনসাধারণের কাছে তা গান হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে; যেমন *চর্যাপদ*কে আদিতে বলা হতো *চর্যাগীতিকা* আর *মঙ্গলকাব্য* পরিচিত ছিল *মঙ্গলগান* হিসেবে। একই ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের বর্তমান সময়ে প্রচলিত বেশকিছু আঙ্গিক রয়েছে যেগুলো পরিপূর্ণভাবে নাট্যগুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও নাট্য ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ক্রমাগত গীত নামেই পরিচিতি পেয়ে এসেছে; যেমন, নাথগীতিকা, কুশান গান, যুগীর গান, মাদার পীরের গান, ভোজপুরী গান, পদ্মাপুরাণ গান, কান্দনী বিষহরীর গান, মানিক পীরের গান, কিচ্ছা গান, নছিমন গান, যাত্রা গান, ভাসান গান প্রভৃতি। উল্লিখিত নাট্য আঙ্গিকগুলোর পরিবেশনাদৃষ্টে লক্ষ করা যায় তা নাট্যের শিল্পশর্ত পরিপূর্ণভাবেই পূরণ করেছে। কিন্তু মূলত আখ্যান শুরু হয় গীত সহযোগে এবং আখ্যান শেষও হয় গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এমনকি আখ্যানস্থিত অধিকাংশ ঘটনা গীত সহযোগে উপস্থাপিত হয়। যেখানে গীতকে আখ্যান থেকে পৃথক করলে গীত ও আখ্যান উভয়ই শিল্পগুণ হারায়।

অতি প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বাংলা নাটক ও সংগীতে যে অবিচ্ছেদ্য ধারা এদেশে প্রবহমান, অঞ্চলভেদে তার রূপ ভিন্ন হলেও বিশেষ কিছু শিল্পশর্তে তা অভিন্ন। সহস্র বছরের এই নাট্য ইতিহাসের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনাভিজ্ঞতা-উৎসব-পার্বণ উদ্‌যাপন, জীবন সংকট মোকাবেলা, রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা, সন্তান কামনা, বাসনা, লৌকিক দেবী বা পির পিরালির মাহাত্ম্য প্রকাশের ইচ্ছা প্রভৃতি। সহস্র বছর আগেই মনুষ্য জীবন-অভিজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নাট্য পরিবেশনের ধারা শুরু হয়েছিল যা কখনোই নিরবলম্ব ছিল না। এ ধারার মূল অবলম্বন ছিল গীত। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন *চর্যাপদে*– 'নাচণ্ডি বাজিল গাণ্ডি দেবী/ বুদ্ধ নাটক বিসমা হে ভই' এই বাণীবাক্য সে-কথারই আভাস দেয়।

সহায়কপঞ্জি

করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রথম খণ্ড। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গীতাসেন গুপ্ত (১৯৭৫)। *বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক জিজ্ঞাসা*। জিজ্ঞাসা প্রকাশন, কলকাতা।

জামিল আহমেদ (২০০০)। 'নাটক ও নাট্যকলা'। *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১*। সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

মন্মথমোহন বসু (১৯৫৯)। *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩২)। *সংগীত চিন্তা*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

লায়লা ফেরদৌস হিমেল (২০১৮)। *ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য আলকাপে সংগীত ও নৃত্যের প্রয়োগশৈলী*। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

শশিভূষণ দাশ গুপ্ত (১৩৭১)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা।

সুকুমার সেন (১৯৭০)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড। পূর্বার্ধি, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সেলিম আল দীন অনূ. (১৯৮৯)। *নন্দীকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ*। কথা প্রকাশন, ঢাকা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৯৭০)। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা।

Muhammad Shahidullah (1966). *Buddhist Mystic Songs* (Revised and enlarged edition). Bangla Academy, Dhaka.